ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন চাই

ড. তোফায়েল আহমেদ, নির্বাহী সদস্য, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

১১ ডিসেম্বর ২০১৪

আটকে আছে, আটকে গেছে, গলায় বিঁধে যাওয়া কাটার মতো। ফেলাও য়ায় না, গেলাও দুষ্কর। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। ২০০৭ থেকে ২০১৪–সাত সাতটি বছর। তারও পাঁচ বছর আগে হয়েছিলো একক সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন। ২০১১ সালে এক ঢাকা দুই কর্পোরেশনে বিভক্ত হলো। অনেকে মেয়র হবার স্বপ্নে বিভোর হলেন, কিন্তু হলো না, হচ্ছে না নির্বাচন। এখন সরকার, অসরকার, বেসরকার (দেশে বিরোধী দল নেই বলে ফালতু শব্দগুলো আমদানি করতে হলো) কেউই আর নির্বাচন চায় বলে মনে হয় না। ঢাকায় কোন দিন নির্বাচন হয়েছিলো বা নির্বাচন হওয়া দরকার, এ কথা ভাবার কেউ আর অবশিষ্ট আছে বলেও মনে হয় না।

ধরুন, আগামী ৯০ দিন পর ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন হবে। বলতে পারেন, কারা নির্বাচনে প্রার্থী হবে বা কারা নির্বাচিত হবে? কী লাভ হবে ঢাকার মানুষের? কী লাভ হবে দেশের? আর ক্ষতিগুলোই বা কার? দেশে নির্বাচন তো অনেক হলো। নির্বাচিত নেতা-নেত্রীর সংখ্যাও অনেক। সব মিলিয়ে ৭০ হাজারের মত। তাঁরাই বা কী করছেন?

দুই খণ্ড ঢাকায় আরও ১২০-১৩০ জন নির্বাচিত হয়ে আর এমন কী-ই বা উদ্ধার করবেন।

বর্তমান সময়ে বিশেষত ২০১৪ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রসঙ্গ মানে ন্যাড়াকে আবার বেলতলায় টেনে নেওয়া। দশম জাতীয় সংসদ, চতুর্থ উপজেলা পরিষদ এবং সাম্প্রতিক কিছু বিচ্ছিন্ন উপনির্বাচনের পর কোন ন্যাড়াই বেলতলায় যেতে চাইবে না। তবে দুই কানই যাদের কাটা, তাদের জেতার জন্য নির্বাচনে যেতে উৎসাহের কমতি থাকার কথা নয়।

এ দেশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে আর ডোবে। জোয়াভাটা হয়। দিন যায় রাত আসে। মানুষ খায়-দায়-ঘুমায়। যানজটে বসে বসে খিস্তি-খেউর করে। ঈদ, পূঁজায়, বাস-ট্রেন-লঞ্চে বোঝাই হয়ে গ্রামে যায়। সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। নদীতে লাশ। পাবলিক পরীক্ষা, সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষায় সর্বত্র প্রশ্নপত্র ফাঁস। নামতে নামতে অন্ধকারের গভীরতার শেষ প্রান্তে। উন্নতির গতি থেমে নেই। উড়ালসড়ক, পাতালসড়ক, এক্সপ্রেস হাইওয়ে, সাঁকো, সেতু সবই হচ্ছে। হেতু সবার জানা। চারদিকে খেকো। গাছ, বন, নদী, সেতু, সাঁকো সবই খেকোকবলিত। তেতাল্লিশ নদীর শহর ঢাকার ৪০৪ বছর পুরো হলো। তেতাল্লিশটির মধ্যে তিনটিও অক্ষত নেই। সারা পৃথিবী জানল বসবাসযোগ্যতার নিম্নতম স্তরে এ শহর তলিয়ে যাচ্ছে। উন্নতির গতি দিন দিন অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু দিনান্তে জন-দুর্গতি ততোধিক দুঃসহ ও অসহনীয়।

হায় নির্বাচন! তুমি কী? দুর্গতিনাশিনী, না অসুর? এই তো সেদিন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অসুর বধে, মুসলমানরা পশু কোরবানির উৎসবে মাতলেন। দুর্গত ঢাকার অবরুদ্ধ নির্বাচন কি আরেকটি নতুন উৎসব হয়ে ধরা দেবে এ দেশের অধরা রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ভাগ্যাকাশে?
ঢাকায় এখন প্রায় ৪০ লাখ ভোটার, কোটির অধিক লোক। নির্বাচনের প্রতি কারো কোন ঝোঁক আছে বলে মনে হয় না। সংবিধান, আদালতের রায়, গণতন্ত্রের নীতি-নিয়ম সবই নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ফুটন্ত কড়াই থেকে জলন্ত উনুনে পড়তে চায় না। ভোটের গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরতন্ত্র, অগ্রগতি ও দুর্গতি এবং প্রত্যাশা আর হতাশা এখানে একাকার। এমতাবস্থায় ঢাকার নির্বাচন আমাদের জন্য কী নিয়ে আসতে পারে। ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। হয়তো গণতন্ত্র, সুশাসন কিছুই নাহি পাব, তবু নির্বাচন চেয়েই যাব। চাইতেই হবে। যা নাই, তা তো নাই-ই, যা আছে তা হারাতে চাই না। সদাশয় সরকার বাহাদুর, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, ঢাকার নির্বাচন আর কত দূর?

জেলা পরিষদের শূন্য উদ্যানেও নির্বাচনের ফুল ফুটুক

একসময় ব্যাবিলনের 'শূন্য উদ্যানে'র কথা পড়েছি। প্রযুক্তির উৎকর্ষের বর্তমান সময়ে শূন্য উদ্যান সৃষ্টি খুবই সম্ভব। গ্রামগঞ্জে প্রকৌশলী ও রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার প্রতীক সৌধ হিসেবে কিছু পরিত্যক্ত সেতু দেখা যায়। সেতুর দুই পাশে কোন সংযোগ সড়ক নেই, শুধু শূন্যে একটি ঝুলন্ত সেতু। মানুষ সেতুর পাশের হাঁটাপথে যাতায়াত করে। সেতুটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান জেলা পরিষদ গণতন্ত্রের তেমনি একটি শূণ্য উদ্যান। একদিকে এটি শূন্যে স্থাপিত,

অপরদিকে এটি জনপ্রতিনিধিশূন্য। এটি একটি সংযোগ সড়কবিহীন পরিত্যক্ত 'ঝুলন্ত সেতু'ও বটে, যেখানে পারাপারের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেতুর মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণে বড় অঙ্কের খাই-খরচা আছে।

জেলা পরিষদ বাংলাদেশের শুধু নয়, উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল স্থানীয় সরকার। ব্রিটিশ থেকে পাকিস্তান সময়কাল প্রায় ১৪০ বছর এ প্রতিষ্ঠানটি নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে একটি শক্তিশালী কাঠামো ও কার্যপ্রণালিগত রূপরেখায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বানরের পিঠা ভাগের সংকীর্ণ রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের বলি হয় জেলা পরিষদ। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো 'শর্টকার্ট' পদ্ধতিতে পদ লাভ এবং দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জেলাকে নিয়ে নানা অসংবিধানিক খেলায় মেতে ওঠে। কখনো 'জেলা গর্ভনর' (আওয়ামী লীগ), কখনো 'জেলা উন্নয়ন সমন্বয়ক' (বিএনপি), কখনো সাংসদদের মধ্য থেকে 'জেলা পরিষদ সভাপতি' (জাতীয় পার্টি), কখনো বা 'জেলা মন্ত্রী' (আওয়ামী লীগ)। এভাবে নানা টালবাহানায় সর্বশেষ যুক্ত হলো 'প্রশাসক'। আমলাতন্ত্র সুকৌশলে এসব কাজে যখন যে সরকার ক্ষমতায় ছিলো তাদের মদদ দিয়ে গেছে, যাতে জেলায় পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বশীল কোন শাসনকাঠামো গড়ে না ওঠে। জেলায় 'ডেপুটি কমিশনার' এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্য সব সময়ই অক্ষুণ্ন রাখার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত। আমলাতন্ত্র কখনোই জেলার অন্য কোন, অন্য কারও কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব চায় না। 'জেলা প্রশাসক' নামক অলীক একটি 'স্বপ্নসৌধ' ধরে রাখতে চায় তারা যেকোন মূল্যে। এমনকি সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে হলেও তা করতে কারও কোন দ্বিধা নেই।

বর্তমানে বিভাগ ও জেলার প্রশাসনব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ের ব্রিটিশ কাঠামো রক্ষা করা হলেও তার কাজকর্মে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। সর্বময় ক্ষমতাধর রাজপ্রতিনিধি হিসেবে শাসন, বিচার, উন্নয়ন ও সব সেবাকর্মের নিয়ন্তা জেলা প্রশাসকের কাজ, ক্ষমতা ও প্রয়োজন এখন অনেকটা ভিন্ন। এখন জেলার সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর অধিদপ্তর কার্যত স্বাধীন। পৃথক হয়েছে বিচার ব্যবস্থা। তাই জেলার সাধারণ প্রশাসনের কর্মপরিধি ও কর্মপ্রকৃতিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের আরও অনেক উপাদান রয়েছে। বিশেষত বস্তুগত ও তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকায়নের কারণে পূর্বতন 'বিভাগ' পদ্ধতির ধারাবাহিকতাও সময়ের নিরিখে অপচয়ী, অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি হিসেবে প্রতীয়মান। এ ক্ষেত্রে দেশের প্রতিটি জেলার অবকাঠামো, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূল থাকা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। জেলা পরিষদ উপমহাদশের সর্বত্র রয়েছে। ভারতে জেলা পরিষদ বেশ ভালোভাবেই কাজ করছে। জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, রাজ্যসভা, লোকসভা ও বিধানসভার সরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্য কারও সঙ্গে কোথাও বিনাশী সংঘাত নেই। রাজনৈতিক মতদ্বৈততা থাকতেই পারে।

কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সৃষ্টিছাড়া প্রথা ও পদ্ধতি সৃষ্টি করে চলেছি। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে চলেছি। 'জেলা পরিষদ আইন, ২০০০'-এর ধারা ৮২ বলে জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসক নিয়োগ একটি স্বল্পকালীন অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু এ ব্যবস্থাই যেন পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। এখন সেই প্রশাসকেরা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা চান, কিন্তু নির্বাচন চান না। তাঁরা সবাই পেশায় রাজনীতিবিদ। এই যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সংবিধানের দরকার কী?

প্রশাসকদের মন্ত্রীর মর্যাদা চাওয়ার বিষয়টি শুনে মনে হলো 'চটি জুতার আবার ফিতে চাই' কিংবা 'লুঙ্গিতে পকেট সংযোজনে'র কথা। এসব ভ্রান্তিবিলাস পরিহার করে নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ এবং সুস্থির ও সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টা হিসেবে প্রয়োজন বিভাগ ও জেলার প্রশাসনিক সংস্কার। প্রয়োজন নির্বাচিত ও সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বশীল একটি জেলা পরিষদ এবং দেশের রাজধানী শহর ঢাকার সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠান। সরকার যা খুশি করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে দেশের সংসদ ও সংসদের বাইরের বিরোধী দল কিংবা নাগরিক সমাজেরও এসব বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। নেই কোন সুদূরপ্রসারী চিন্তা। বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয় সব রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যাপক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সময়োপযোগী একটি জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন এবং তা নির্বাচনের পূবেই।